Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 57
January-March, 2019

ইবনে খালদুনের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক ধারণা : একটি বিশ্লেষণ

Insightful Sociological Ideas of Ibn Khaldūn : An Analysis

Jannatul Fardaos*

ABSTRACT

This article primarily intends to elucidate the philosophy of Ibn Khaldun regarding the various issues inextricably connected with the society. Ibn Khalun, one of the most eminent Muslim scholars of the fourteenth Christian century, has inaugurated a new era in world history by authoring 'Al-Muqaddima'. In this book he delineated the human history exclusively from a different perspective. Despite this book heralded a new scholarship in social sciences controversy exists whether he could be treated as the first exponent of social science. Outlining the general ideas of social science this article has spelt out the thoughts of Ibn Khaldun regarding society. This article has showed that though lots of work have been authored on the sociological thoughts of Ibn Khaldun most of them have basically focused on the theory of Asabiyyah advanced by him. Apart from the theory of Asabiyyah Al-Muqaddima also bears the testimony of unique ideas of Ibn Khaldun regarding social evolution, rise and decline of dynasties, division of civilization.

Keywords: Ibn Khaldun, social theory, asabiyyah, human civilization, rise and decline of regalities

সারসংক্ষেপ

সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে ইবনে খালদুনের দর্শন বিশ্লেষণই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন 'আল-মুকাদ্দিমা' রচনা করে বিশ্ব ইতিহাসে এক যুগান্তরকারী অধ্যায়ের সূচনা করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানব ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তাঁর রচিত এ গ্রন্থটি সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের ধারায় নতুনত্বের সূচনা করলেও তাঁকে সমাজবিজ্ঞানের প্রথম প্রবক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে কিনা এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে রচিত আলোচ্য প্রবন্ধে সমাজতত্ত্বের সাধারণ ধারণা প্রদানপূর্বক ইবনে খালদুনের রচনায় প্রদত্ত সমাজ সম্পর্কিত ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর সমাজতাত্ত্বিক ধারণাসমূহ নিয়ে অনেক কাজ হলেও অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানীই অন্যান্য ধারণা থেকে আসাবিয়্যাহ্ তত্ত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আসাবিয়্যাহ্ ছাড়াও আল-মুকাদ্দিমায় সামাজিক বিবর্তন, রাজশক্তির উত্থান-পতন ও সভ্যতার বিভাজন ইত্যাদি সম্পর্কে ইবনে খালদুনের ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

মূলশব্দ: ইবনে খালদুন, সমাজতত্ত্ব, আসাবিয়্যাহ্, মানব সভ্যতা, রাজশক্তির উত্থান-পতন।

* Jannatul Fardoas is a Masters student in the department of Islamic Studies, University of Dhaka, Bangladesh, email: jannatdu2013@gmail.com

ভূমিকা

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই কালের বিবর্তনে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। আবহমান কাল থেকে চলে আসা এ সামাজিক বিবর্তনই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। সমাজবিজ্ঞান মানবসমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা-পর্যালোচনা করে নতুন আঙ্গিকে সমাজের রূপরেখা প্রণয়ন করে। এছাড়াও সমাজবিজ্ঞান মানবজীবনের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যসহ সমগ্র পৃথিবীতে সমাজবিজ্ঞান জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করেছে, বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রি.) পর ইউরোপে সমাজবিজ্ঞান ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং ইউরোপের ইতিহাসে এক নবঅধ্যায়ের সূচনা হয়। পাশ্চাত্যে সমাজবিজ্ঞান প্রসারতা লাভ করলেও মুসলিম সমাজে এর অবদান অসামান্য নয়। মূলত সমাজতত্ত্ব হলো সামাজিক বিজ্ঞানের একটি অংশ, যা সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে।

সমাজবিজ্ঞানে অবদানের জন্য মুসলিম মনীষীদের মধ্যে ইবনে খালদুন এর নাম অগ্রগণ্য। তিনি খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে মানব সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে এক অভিনব ধারণার উন্মেষ ঘটান। যার প্রধান ভিত্তি হল আসাবিয়্যাহ্। তিনি মানব সমাজের গতি-প্রকৃতি, উত্থান-পতন ও বিবর্তন ইত্যাদিকে আসাবিয়্যাহ্ এর ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন। মূলত দুটি প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে এ গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রথমত, ইবনে খালদুনের সমাজ সম্পর্কিত ধারণাসমূহকে সমাজবিজ্ঞানের

প্রথম তত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করা যাবে কি-না? দ্বিতীয়ত, ইবনে খালদুন প্রদত্ত সমাজতত্ত্বের সাথে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের মিল রয়েছে কি না? আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো ইবনে খালদুনের সমাজ সম্পর্কিত ধারণাসমূহ ব্যাখা করে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে এর সাদৃশ্য তুলে ধরা। আর এ ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা প্রক্রিয়ার (Qualitative Research Approach) সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইবনে খালদুনের আল-মুকাদ্দিমায় প্রদত্ত ধারণাসমূহকে ব্যাখা করার মধ্য দিয়ে উপরিউক্ত প্রশ্ন দুটির উত্তর অনুসন্ধান করে নতুন আঙ্গিকে আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্বের ইংরেজি প্রতিশব্দ Sociology যা ল্যাটিন শব্দ socius (*companion*) এবং গ্রিক শব্দ logos (*studyof*) থেকে এসেছে। অর্থাৎ Sociology এর অর্থ হল - *Study of companionship*। সামাজিক সম্পর্কসমূহের উন্নয়ন, অবকাঠামোগত বিশ্লেষণ এবং সামষ্টিক আচরণের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নকে সমাজতত্ত্ব বলা হয়ে থাকে (Stolley 2005, 01)। সমাজবিজ্ঞানী অ্যান্থনী গিডেন্স এর মতে, সমাজতত্ত্ব হল মানুষের সামাজিক জীবন, বিভিন্ন দল এবং সমাজসমূহের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন (Giddens 2015, 04)। যেহেতু সমাজবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করে থাকে সেহেতু সমাজতত্ত্ব সাধারণত সামাজিক সম্পর্কসমূহ ব্যাখা ও সামাজিক আচরণের রীতি-নীতি পর্যবেক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। যার অন্যতম লক্ষ হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের রূপরেখা প্রণয়ন করা, এজন্য সমাজতত্ত্বকে আধুনিকতাবাদের ফসল বলা হয়ে থাকে (Bryan 2009, 19-20)।

মূলত দর্শনের উপর ভিত্তি করেই সমাজতত্ত্বের উদ্ভব হয়। ধারণা করা হয় যে, প্রাচীন গ্রিসেই সমাজতত্ত্বের জন্ম। প্রাচীনকালে বিভিন্ন গ্রিক দার্শনিক তাদের লিখনীর মধ্যে তৎকালীন সমাজচিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এমনকি প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিস্টপূর্ব), এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্ব) ও চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের ইতিহাসের মধ্যেও সামাজিক ধারণা বিদ্যমান ছিল। তৎপরবর্তী খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনা ইতিহাসবিদ মাও সেতুং এর Wen Hsien T'ung K'ao (*General Study of the Literary Remains*) এবং খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবনে খালদুনের আরব সমাজ অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে সমাজতত্ত্বের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় (Stolley 2005, 04)। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ কর্তৃক প্রবর্তিত ধারণার মধ্য দিয়ে ইউরোপে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব হয় (Dhaouadi 2006, 49)। তিনি তার Positive Philosophy তত্ত্বের মধ্যে সর্বপ্রথম

Sociology শব্দটি ব্যবহার করেন (Stolley 2005, 05)। যদিও অগাস্ট কোঁৎ কে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়; কিন্তু তার বহু পূর্বেই ইবনে খালদুন ইল্‌ম আল উমরান (*Ilm Al- Umran*) ধারণা প্রদানের মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব করেন (Al-Attas 2006/3, 15)।

অগাস্ট কোঁৎ কর্তৃক প্রবর্তিত সমাজবিজ্ঞানের ধারণা পশ্চিমা দেশসমূহের মধ্যে বহুল প্রভাব বিস্তার করেছে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে পশ্চিমা বিশ্বে আরো অনেক সমাজবিজ্ঞানীর উদ্ভব হয়। যারা সামাজিক পরিবর্তন, উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং সামাজিক বিবর্তনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে ব্যাখার মধ্য দিয়ে নগরায়ণ (Urbanization), আধুনিকতাসহ (Modernism) নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটিয়েছেন।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জীবন ধারণ, নিরাপত্তা ও মৌলিক চাহিদা পূরণের তাগিদে দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে পছন্দ করে। যদিও বর্তমানে একত্রে বসবাসের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিকসহ আরো বিভিন্ন কারণ রয়েছে। ফলে বলা যায় যে, মানব সমাজের মধ্যে বহু আগে থেকেই সমাজতত্ত্বের ধারণা বিদ্যমান। সাধারণত সমাজতত্ত্বের মধ্যে সামাজিক জীবন যাপনের রীতি-নীতি সম্পর্কে কাঠামোগত ব্যাখা-বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

ইবনে খালদুনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইতিহাস দর্শনের জনক মুসলিম মনীষা ওয়ালীউদ্দিন আবু যায়েদ আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদুন আল-হাযরামী ১ রমজান, ৭৩২ হিজরি (২৭ মে, ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দ) তিউনিসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (Enan 2006, 02)। তাঁর মূল নাম আবদুর রহমান; ডাকনাম আবু যায়েদ। কিন্তু পারিবারিকভাবে তিনি ইবনে খালদুন নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ দক্ষিণ আরবের হাযরামাউতের কিন্দা গোত্রের বাসিন্দা ছিলেন (Irwin 2018, 24)। তাঁর ঊর্ধ্বতন যে পুরুষ খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে আন্দালুসিয়া তথা স্পেনে আসেন তার প্রকৃত নাম কি ছিল তার সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ঐতিহাসিকগণ বিশেষত স্পেনীয় মুসলিম ঐতিহাসিক ও ফিকহবিদ ইবন হাযম যাহিরী (৩৮৩-৪৫৬হি.) মনে করেন, তাঁর ঐ পূর্বপুরুষের নাম ছিল খালিদ, যা পরবর্তীতে বিকৃত উচ্চারণ হয়ে খালদুনে পরিণত হয়। ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেকে খালদুন বংশের দশম পুরুষ হিসেবে দাবি করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে নসবনামা এমন, আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আল-হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন জাবির

ইবন মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন আব্দুর রহমান ইবন খালদুন। অবশ্য তিনি নিজেই এ ব্যাপারে সন্দিগ্ধ, কেননা তিনি মনে করেন প্রতি এক শতাব্দীতে তিন প্রজন্ম বসবাস করেন। সে হিসেবে তাঁর জন্ম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সাতশত বছরে এর সংখ্যা ২০ এর ওপর থাকার কথা (Ibn Khaldūn 1979, 3-7)।[১] তবে তাঁর নামের শেষের হাযরামী উপাধি দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। তার পরিবার দীর্ঘকালীন সময় স্পেনে বসবাস করে এবং সেখানে তারা রাজকীয় উচ্চপদে দায়িত্ব পালন ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করে।

১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে খ্রিস্টানদের অগ্রাভিযানের ফলে তাঁর পরিবার সেভিল ত্যাগ করে উত্তর আফ্রিকার মরক্কোতে হিজরত করে (Baali 1988, 01)। ফলে তার পরিবারের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস সংরক্ষিত হয়নি। উত্তর আফ্রিকায় হিজরতের পর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসের সুযোগ পেলেও তাঁর পরিবার তিউনিসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং ইবনে খালদুন সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার বাবার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে মহামারি প্লেগ রোগে তার পিতা মাতা উভয়েই মৃত্যুবরণ করলে তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন (Enan 2006, 09)। কিন্তু জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা তাকে বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের শরণাপন্ন করে। সেসময় তিনি হাদিস শাস্ত্রে শিক্ষা নেয়ার জন্য আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে জাবির ইবনে সুলতান আল ওয়াদিওয়াশী এর নিকট গমন করেন (S. F. Al-Attas 2015, 03)। এছাড়াও তিনি মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আল আরবিলীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন; যিনি তাকে যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ও গণিত শিক্ষা প্রদান করেন (Irwin 2018, 26)। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে হাফসি সম্রাট আবুল হাসান তিউনিসে আসার সময় বহু জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর সাথে আসেন। তখন ইবনে খালদুন তাদের সান্নিধ্যে সময় কাটান এবং জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত হন। তৎকালীন সুলতান আবু মুহাম্মদ ইবনে তাফরাকীন তাকে "সাহিব আল আলামা" (*Seal Bearer*) পদে নিয়োগ দান করেন (Enan 2006, 09)। তিনি সরকারী পত্রসমূহের উপরে "আলহামদুলিল্লাহ" এবং শেষে "আশশুকরুলিল্লাহ" এই বাক্য দুইটি লিখতেন। তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ বছরেরও কম। এছাড়াও তিনি

১. এ প্রসংগে তিনি নিজেই বলেন,

ويغلب على الظن أنهم أكثر، وأنه سقط مثلهم عددا، لأن خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس، فإن كان أول الفتح فالمدة لهذا العهد سبعمائة سنة، فيكون زهاء العشرين، ثلاثة لكل مائة..
(Ibn Khaldun 1979, 3)

কর্মজীবনে প্রশাসক, কূটনীতিবিদ, বিচারক ও শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (Irwin 2018, 24)। কিন্তু জ্ঞানার্জনের তীব্র স্পৃহা তাঁকে তিউনিস ত্যাগে বাধ্য করে। তিউনিস থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন বেদুইন সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তিনি তাদের সাথে কিছু সময় একত্রে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি গ্রানাডা, বিস্করাসহ বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন এবং সেই সাথে তাঁর উপর অর্পিত বিভিন্ন রাজকীয় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় উত্তর আফ্রিকার রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও বিভিন্ন গোত্রের মাঝে ব্যয় করার কারণে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। উক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বনূ আরিফ গোত্রের সালামা দুর্গে অবস্থানকালে ৪৫ বছর বয়সে তিনি আল-মুকাদ্দিমা লিখতে শুরু করেন এবং ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে মাত্র পাঁচ মাস সময়ে তিনি মুকাদ্দিমা রচনা সমাপ্ত করেন (Enan 2006, 51-52)। অতঃপর তিনি মিসরে গমন করেন এবং ৭৮৬ হিজরীতে (১৩৮৬ খ্রিঃ) মালেকী মাযহাবের 'কাযীউল কুযাত' (প্রধান বিচারপতি) পদে অধিষ্ঠিত হন (Al-Alam 1989, 46)। তবে বহুবিধ কারণে তাঁকে কয়েক দফায় উক্ত পদ থেকে অপসারিত এবং পুনরায় অধিষ্ঠিত করা হয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবনের শেষ ২৩ বছর মিসরে শিক্ষকতা ও বিচারকের পেশায় অতিবাহিত করেন। এই মহান মনীষী ১৬ মার্চ ১৪০৪ খ্রিঃ মিসরে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁকে সূফি কবরস্থানে দাফন করা হয় (Baali 1988, 03)।

ইবনে খালদুন ও সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। তাই সমাজতত্ত্বকে সমাজবিজ্ঞানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হয়। ইবনে খালদুন সর্বপ্রথম মানব সমাজকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে সমাজের বিশুদ্ধ ইতিহাস রচনার নতুন পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। তাঁর রচনায় স্বতন্ত্র ভাব থাকলেও তাঁর উপর পূর্ববর্তী বিভিন্ন গ্রিক ও মুসলিম দার্শনিকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি যেমন ইবনে সীনা ও ইবনে রুশদের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তেমনি প্লেটো এবং এরিস্টটলের দর্শন থেকেও প্রভাবমুক্ত ছিলেন না, বরং এ ব্যাপারে আগ্রহান্বিত ছিলেন (Nuruzzaman 2013, 17)। প্লেটো রচিত Republic গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের আদি স্বরূপ কৌম অভিজাততন্ত্রের সাথে ইবনে খালদুনের আসাবিয়্যাহ তত্ত্বের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় (Sen 2008, 21)। তিনি আল-মুকাদ্দিমায় তৎকালীন সমাজচিত্র, বেদুইন জীবন, গোত্র, রাষ্ট্র, নাগরিক জীবন, জীবিকা অর্জনের উপায় ও স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা করেন; যে বিষয়গুলো বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন Social

Ecology, Rural Sociology, Urban Sociology, Political Socilogy ইত্যাদির মধ্যে আলোচিত হয়ে থাকে (Al-Attas 2006/1, 400-401)। তিনি যেমন পূর্ববর্তীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তেমনি পরবর্তীকালের অনেককেও প্রভাবিত করেছিলেন। ঊনিশ শতকে পাশ্চাত্যের কতিপয় সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনকে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন, যাদের মধ্যে Ludwig Gumplowicz, Franz Oppenheimer ও Ortega y Gasset রয়েছেন (Al-Attas 2006/2, 786)।

ফলে ইবনে খালদুন ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাঁর প্রদত্ত সমাজতত্ত্বের ধারণাসমূহ আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে গুরুত্ব বহন করে।

ইবনে খালদুনের রচনাসমূহ

ইবনে খালদুনের প্রধান রচনাসমূহ হল:

১. কিতাব আল ইবার ওয়া দিওয়ান আল মুবতাদা ওয়াল খবর ফি আইয়্যাম আল আরব ওয়াল আজম ওয়াল বারবার ওয়া মান 'আসারাহুম মিন যাওয়ী আল সুলতান আল আকবর (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر)।

২. মুকাদ্দিমা লি কিতাব আল ইবার (مقدمة لكتاب العبر);

৩. লুবাব আল মুহাসসাল ফি উসূল আদ্ দীন (لباب المحصل في أصول الدين);

৪. আল তা'রিফ বি ইবনে খালদুন ওয়া রিহালাতাহু গারাবান ওয়া শারাক্বান (التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا) (Al-Attas 2006/1, 400)

ইবনে খালদুনের অনেক রচনা থাকলেও এ প্রবন্ধে আল মুকাদ্দিমাকে ভিত্তি করেই সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনে খালদুনের রচনায় সমাজতত্ত্ব

সমাজ থেকেই ইতিহাসের উৎপত্তি। ইতিহাসের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজ জীবনকে যথাযথ উপস্থাপন করা যায়; যার মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবর্তন, উন্নয়ন, আধুনিকায়নকে ব্যাখ্যা করে নতুন জ্ঞানের উন্মোচন করা সম্ভব হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আরব বংশোদ্ভুত ইবনে খালদুন আল-মুকাদ্দিমা রচনার মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের নতুন ধারণা প্রবর্তন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে মধ্যযুগে যখন ইউরোপ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল ঠিক তখনই মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন নগরীসমূহ যেমন দামেশ্ক, বাগদাদ, কর্ডোভা ইত্যাদি জ্ঞান বিজ্ঞানের শীর্ষে অবস্থান করছিল। ইবনে খালদুন মূলত একজন ইতিহাসবিদ হলেও তাঁর রচনায় ইতিহাস,

দর্শন, সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তা এই চারটি বিষয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি সমাজবিজ্ঞানের যে ধারণা প্রদান করেন তা সভ্যতার বিবর্তন ও বিনির্মাণে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে কার্লমার্কস (Karl Marx), এমিল ডুর্খেইম (Emile Durkheim), ভিলফ্রেডো প্যারেটোসহ (Vilfredo Pareto) আরো অনেক মনীষীকে প্রভাবিত করেছিল। যার ফলে ইবনে খালদুনের আসাবিয়াহ তত্ত্বের সাথে এমিল ডুর্খেইমের ১৮৯৩ সালে প্রদত্ত 'সামাজিক সংহতি' তত্ত্বের সঙ্গতি দেখতে পাওয়া যায়, এছাড়াও আল মুকাদ্দিমায় বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান পতনের যে বিবরণ ইবনে খালদুন প্রদান করেছিলেন তার সাথে ভিলফ্রেডোপ্যারেটোর 'সারকুলেশন অভ এলিট'' তত্ত্বের মিল লক্ষ্য করা যায় (Nuruzzaman 2013, 18)। আরব জাতিকে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করার কারণে ইবনে খালদুনের সমাজচিন্তাকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম মতবাদ (School of Sociological thought) হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Dhaouadi 2006, 48)। ইবনে খালদুন তাঁর রচনায় সমাজতত্ত্বের যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হল আসাবিয়াহ তত্ত্ব। এছাড়াও তিনি সভ্যতার বিভাজন, সামাজিক বিবর্তন, বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতন ও ক্ষমতার প্রতিপত্তি নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে তাঁর সমাজ দর্শনসমূহ তুলে ধরা হল-

আসাবিয়্যাহ্ তত্ত্ব

আসাবিয়্যাহ্ শব্দটি আরবি (عصبيّة) থেকে এসেছে। যার অর্থ গোত্র প্রীতি বা গোত্র চেতনা। সাধারণত আসাবিয়্যাহ্ বলতে বিচার বিবেচনা না করে নিজ জাতির অন্ধ অনুকরণ বা অনুসরণ করাকে বোঝায়। কিন্তু ইবনে খালদুন তাঁর রচনায় আসাবিয়্যাহ্ বলতে সামাজিক চেতনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, গোত্র প্রীতি ও বংশধারার মাধ্যমে যদি কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। কারণ, মানুষের স্বভাবতই নিজ জাতির প্রতি আকর্ষণ থাকে (Ibn Khaldūn 2017, 244)।

প্রকৃতিগতভাবেই মরুভূমিতে বসবাসরত বেদুইনদের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হত। তাই তারা সম্মিলিতভাবে কোন গোত্রপতির অধীনে বসবাস করতে পছন্দ করত। যে দলের গোত্রপ্রধান শক্তিশালী ছিল এবং সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি বেশি ছিল সে গোত্র অন্য গোত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হত। এভাবেই বিভিন্ন গোত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হয় এবং সেই গোত্রসমূহ প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠে। জাহেলী যুগেও আরব জাতির মধ্যে প্রবল গোত্রপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়। ইবনে খালদুন এ গোত্রপ্রীতিকে আসাবিয়্যাহ্ নামে অভিহিত করেছেন। তিনি গোত্রপ্রীতির তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যথা- সাহায্য, প্রতিরোধ ও পরস্পর

চাহিদা পূরণ (Ibid, 264)। সাধারণত যে গোত্রসমূহ আসাবিয়্যাহ্ এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রবল মানসিকতা থাকে। তাই যখন একটি গোত্রের সমগ্র ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট লক্ষ অর্জনের জন্য একত্রিত হয় তখন তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে; তখন প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে গোত্রের সকলে সমীহ করে এবং এভাবেই নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। এ প্রসংগে অনুপম সেন বলেন "কৌম সমাজের বৈশিষ্ট্য সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট স্থান থাকে, যা তাকে সমাজে নিরাপত্তা দেয়। কৌম সমাজ সুনির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ বা টেবু (*tabbo)* করে যেগুলো সমাজের দৃষ্টিতে অলংঘনীয় বলে মনে হয়" (Sen 2008, 15-16)।

আসাবিয়্যাহ্-র মূল উৎস হলো দুটো- এক. জৈবিক, দুই. সামাজিক (Nuruzzaman 2013, 17)। এখানে জৈবিক বলতে রক্ত সম্পর্কীয় সম্পর্কের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। একই বংশের মানুষ স্বভাবতই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় ও একের বিপদে অপরজন এগিয়ে আসে। সর্বোপরি একজন অপরজনকে সাহায্য করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে। এছাড়াও রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তিবর্গকে নেতৃত্ব বা ক্ষমতার আসনে সমাসীন করতে সকল ধরনের সহায়তা করে থাকে। এ প্রসংগে ইবনে খালদুন বলেন- খুব কম সংখ্যক লোক ব্যতীত মানুষের স্বভাবে রক্ত সম্পর্কের আকর্ষণ বিদ্যমান। এ আকর্ষণের অন্যতম ফলশ্রুতি হলো স্বজন ও ঘনিষ্ঠতার উপর যাতে কোন বিপদ আপতিত ও অবিচার অনুষ্ঠিত হতে না পারে, তাই কামনা করা (Ibn Khaldūn 2017, 245)।

আর অপর উৎস হল সামাজিক, যেটি মানুষের পারস্পারিক বন্ধন থেকে সৃষ্টি হয়। মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে একে অপরের সান্নিধ্য কামনা করে যা তাদেরকে সামাজিক পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ করে। দীর্ঘদিন একই স্থানে বসবাস করার ফলে একের প্রতি অন্যের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। যার ফলে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং পারস্পরিক সাহায্য করতে প্রবৃত্ত হয়। এছাড়াও কোন শাসকের অধীনে বসবাসরত রাজ্যে নাগরিকদের মধ্যে এ বন্ধন লক্ষ্য করা যায়। তবে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর এ বন্ধন নির্ভর করে। যদি কোন রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক সচেতন হয় এবং তাদের শাসকের প্রতি অনুগত থাকে তবে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসে। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্ক যদি দৃঢ় না হয় তাহলে এ বন্ধন শিথিল হতে থাকে। একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পরিবেশগত কারণে তাদের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তাই আসাবিয়্যাহ তত্ত্বে পরিবেশের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

আসাবিয়্যাহ্ ও পরিবেশ

পরিবেশকে আসাবিয়্যাহ্-র অন্যতম অনুষঙ্গ মনে করা হয়। মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। ভৌগলিক তারতম্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অনেক ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেসকল স্থানে জীবনধারণ ও মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন সে অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন লক্ষ্য করা যায়। এজন্য শহরবাসীর তুলনায় মরুবাসীর মধ্যে গোত্রপ্রীতি অধিক পরিমাণে থাকে। ইবনে খালদুন বলেছেন:

> وأهل البدو ... قائمون بالمدافعة عن أنفسهم لا يكلونها إلى سواهم ولا يثقون فيها بغيرهم فهم دائما يحملون السّلاح ويتلفّتون عن كلّ جانب في الطّرق ويتجافون عن الهجوع إلّا غرارا في المجالس وعلى الرّجال وفوق الأقتاب.
>
> প্রান্তরবাসীরা নিজেরাই নিজেদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে থাকে। এর ভার তারা অন্য কারও ওপর ন্যস্ত করে না; বরং অন্য কাউকে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করে না। ফলে তারা সর্বদাই অস্ত্রশস্ত্র বহন করে এবং পথ চলতে চতুর্দিক সতর্কদৃষ্টি রাখে। তারা শুধুমাত্র দলবদ্ধ অবস্থায়, লোক সমাবেশে এবং বাহনের পৃষ্ঠদেশে নিরাপত্তা বোধ করে (Ibn Khaldūn 1988, 1/156)।

অতএব, দলবদ্ধ জীবনধারণ পদ্ধতি তাদের সমাজ জীবনের মূলভিত্তি।

আসাবিয়্যাহ্ ও সমাজ

ইবনে খালদুনের মতে যদি কোন রাষ্ট্রশক্তি তার নিজস্ব গোত্রের যথাযথ সমর্থন পায় তখন উক্ত গোত্র অন্য গোত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে যার চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে রাষ্ট্র গঠন করা। ইবনে খালদুন বলেন:

> ثمّ إذا حصل التّغلّب بتلك العصبيّة على قومها طلبت بطبعها التّغلّب على أهل عصبيّة أخرى بعيدة عنها.
>
> এভাবে এ বৃহৎ গোত্রপ্রীতির সাহায্যে যখন স্বীয় জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারের কাজ সমাপ্ত হয় তখন এ ক্ষমতাবান স্বাভাবিক গতিতেই দূরস্থিত অপর গোত্রাদির উপর প্রাধান্য বিস্তারে অগ্রসর হয় (Ibn Khaldūn 1988, 1/156)।

তাই বলা যায় যে, একটি সভ্যতা সৃষ্টির পেছনে যেমন আসাবিয়্যাহ্-র গুরুত্ব রয়েছে তেমনি আসাবিয়্যাহ্-র চেতনা বিনষ্টের মাধ্যমে একটি সভ্যতা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

সমাজতত্ত্বে আসাবিয়্যাহ্-র প্রভাব

ইবনে খালদুন প্রদত্ত আসাবিয়্যাহ্ তত্ত্বের সাথে এমিল ডুর্খেইমের সামাজিক সংহতি তত্ত্বের মিল লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই মানুষের ব্যক্তিসত্তার সাথে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি যে প্রেরণা কাজ করে এটিকে চিহ্নিত করেছেন এবং একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংহতিকে মূল উপাদান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যার কারণে ইবনে খালদুনকে এমিল ডুর্খেইমেরও পূর্বের সামাজিক সংহতির প্রবক্তা মনে করা হয় (Gilbert 2012, 21)।

ধর্মে আসাবিয়্যাহ্-র প্রভাব

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পাশাপাশি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও আসাবিয়্যাহ্-র ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মহান আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ স. ব্যতীত প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই নির্দিষ্ট জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

> আমি নূহকে তার কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে তার কওম কে ডাক দিয়ে বললেন- হে আমার জাতির লোকেরা আল্লাহর দাসত্ব কর, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ বা প্রভু নেই। আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিনের আযাবের ভয় পোষণ করি (Al- Qur'an, 7:59)।

কোন ধর্ম যদি তার জাতির অধিকাংশ লোকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তবে সে ধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করতে পারে এবং সেটি সমাজ, সভ্যতা ও জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ইবনে খালদুন মনে করেন ধর্ম বিস্তারেও এ আসাবিয়্যাহ তথা গ্রেত্রপ্রীতি বা সংঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনসীকার্য। এরপ্রমান হিসেবে ইতিহাস থেকে তিনি বহু ঘটনা ও দুর্ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

মানব সভ্যতার বিভাজন সম্পর্কিত ধারণা

সভ্যতা বিনির্মাণের প্রয়োজনে সমাজের প্রতিটি মানুষকে বিভিন্ন ধরণের কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। ফলে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের জীবন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। জীবিকা অর্জনের ধরণ-প্রকৃতি ও বসবাসের অবস্থান অনুযায়ী ইবনে খালদুন মানব সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন যথা- বেদুইন জীবন ও নাগরিক জীবন (Ibn Khaldūn 2017, 229)।

বেদুইন জীবনে জীবিকা নির্বাহের নিমিত্তে মানুষ কৃষিকাজ ও পশুপালন ইত্যাদি পেশায় জড়িত হয়। বেদুইনদের প্রধান পেশা হল পশুচারণ করা। যেহেতু পশু

চারণের জন্য উন্মুক্ত প্রান্তর প্রয়োজন এবং কোন নগরীর মধ্যে তা সম্ভব নয়, সেহেতু তাদেরকে প্রতিনিয়ত মরুভূমি পাড়ি দিতে হত। এজন্য তাদের জীবন যাত্রার ধরণ ছিল কঠিন প্রকৃতির ও অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। তাই জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যতীত তাদের অতিরিক্ত কোন চাহিদা ছিল না। ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে প্রান্তরবাসী যাযাবররা তাদের জীবিকার জন্য কৃষি ও পশুপালনের উপর নির্ভর করে থাকে এবং তাদের প্রয়োজনের পরিমাণ অতি সামান্য থাকে (Ibid, 231)। বেদুইনদের অতিরিক্ত কোন অর্থ সম্পদ থাকে না, তাদের সম্পদের পরিমাণ খুবই সামান্য থাকে যা দিয়ে শুধু জীবনধারণ সম্ভব হয়। কিন্তু বিভিন্ন চারণভূমিতে বিচরণ করার পরে যখন তারা একটু সচ্ছল হয় তখনই তাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং যাযাবরী জীবন ছেড়ে দিয়ে তারা নগরে বসবাস করার উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহযোগিতায় তৎপর হয়। ইবনে খালদুন বলেন:

> ثمّ إذا اتّسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرّفه دعاهم ذلك إلى السّكون
>
> যখন এ সকল জীবিকা অর্জনকারীরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হয় এবং অতিরিক্ত সম্পদ ও সুযোগ তাদের হস্তগত হয় তখন তারা স্থায়ীভাবে বাস করতে চায় (Ibn Khaldūn 1988, 1/150)।

এভাবে আর্থিক সচ্ছলতার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের পর অধিবাসীগণ বিভিন্ন ধরণের নির্দিষ্ট পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে, তখন নতুন নগরের গোড়াপত্তন হয়। তারপর নগরে বসবাসরত ব্যক্তিগণ ক্রমান্বয়ে বিলাসী জীবন যাপনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের জীবনমান বেদুইনদের তুলনায় উন্নতমানের হয়। তাদের মধ্যে শিল্প চর্চার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয় এবং রুচিবোধের বিকাশ ঘটে। তখনই তারা বিভিন্ন শিল্প কর্ম নির্মাণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ইবনে খালদুন এ পর্যায় সম্পর্কে বলেন:

> ومعالاة البيوت والصّروح وإحكام وضعها في تنجيدها والانتهاء في الصّنائع في الخروج من القوّة إلى الفعل إلى غايتها
>
> তারা সুউচ্চ গৃহ ও স্তম্ভাদি নির্মাণ, তাদের ভিত্তি সুদৃঢ় ও পাকাপোক্ত করা এবং বিভিন্ন শিল্প কর্মের চরমরূপ তুলে ধরার জন্য সম্ভাব্য শক্তিকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়" (Ibn Khaldūn 1988, 1/150)।

নগরে বসবাসরত ব্যক্তিবর্গ সাধারণত ব্যবসা অথবা শিল্পকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। যেহেতু সভ্যতার বিনির্মাণে পশুপালন ও ব্যবসা দুটোই গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু বেদুইন ও নাগরিক জীবন দুটিকেই ইবনে খালদুন স্বাভাবিক জীবন হিসেবে অভিহিত

করেছেন। তবে তিনি নগর সংস্কৃতিকে সভ্যতার সর্বশেষ পর্যায় হিসেবে অভিহিত করেছেন। কেননা, সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির শেষ পর্যায়ে সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটে আর তখন তার ব্যয়ভার বহন করার জন্য অধিবাসীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয় এবং এর পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে অধিকাংশ মানুষই ধীরে ধীরে অসচ্ছলতা ও অনাহারের দিকে ধাবিত হয়। তখন বাজারে মন্দাভাব দেখা দেয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। আর এভাবেই অর্থনৈতিক পতনের মধ্য দিয়ে একটি সভ্যতার ধ্বংস এবং নগরীর বিলুপ্তি ঘটে (Ibid,620)।

রাজশক্তির উত্থান-পতন সম্পর্কিত ধারণা

একটি সাম্রাজের অবিচ্ছেদ্য উপাদান হল বংশধারা। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে বংশধারার উত্থান-পতনের সম্পর্ক রয়েছে। ইবনে খালদুন আল-মুকাদ্দিমায় বংশ মর্যাদার স্থায়িত্বকাল বর্ণনার মধ্য দিয়ে সামাজিক বিবর্তন ও ক্ষমতার রদবদলের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। তিনি বংশধারাকে মানবদেহের সাথে তুলনা করে জন্ম, পূর্ণতা ও মৃত্যু তিনটি ধাপে বর্ণনা করেছেন (Gilbert 2012, 16)।

ইবনে খালদুন একই বংশধারার বংশকালের স্থায়িত্ব সময়কালকে চার পুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন, সেগুলো হল- বংশের প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিষ্ঠাতার সমসাময়িক অংশীদার, পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসারী এবং বিনষ্টকারী (Ibn Khaldūn 2017, 260-261)। এগুলোর বর্ণানায় তিনি উল্লেখ করেন-

প্রথমত, শুরুর পর্যায়ে যেহেতু ব্যক্তি নিজেই প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত থাকেন তাই তিনি তার বংশকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্ভাবনার সকল উপকরণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করার পাশাপাশি বংশধারার দীর্ঘকালীন স্থায়িত্বের উপাদানসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণে দৃঢ় ভূমিকা পালন করেন।

দ্বিতীয়ত, এ পর্যায় প্রতিষ্ঠাতার পুত্র তার স্থলাভিষিক্ত হয় এবং সে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার সময় তার পিতার নিকট থেকে পূর্ববর্তী অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকার কারণে তার মধ্যে কিছুটা ত্রুটি চলে আসে যা থেকে তার পূর্বপুরুষগণ মুক্ত ছিল।

তৃতীয়ত, পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠাতার পৌত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর সে তার পূর্ববর্তীদের অনুকরণ ও অনুসরণ করার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে, কেননা প্রতিষ্ঠাকালের সাথে দৃশ্যত তার কোন প্রকার সংযোগ ছিল না। ফলে যার উপর ভিত্তি করে বংশ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তথা গোত্রপ্রীতি বা পারস্পরিক সহযোগিতা সেগুলোকে সে অবহেলা

করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে তৃতীয় পুরুষে পৌঁছা অবধি ধীরে ধীরে একটি বংশের গৌরব হ্রাস পেতে থাকে।

চতুর্থত, এ পর্যায়ে দায়িত্বগ্রহণকারী ব্যক্তি তার বংশ প্রতিষ্ঠার সময়কাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন থাকে। সে ধারণা করে, যে কোন প্রকার চেষ্টা ব্যতীত আবহমান কাল থেকেই তাদের বংশমর্যাদা চলে এসেছে এর ফলে সে গোত্রীয় সম্পর্কের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে এবং নিজের অধীনস্থদের তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে। যার ফলশ্রুতিতে তখন বিদ্রোহ হয় এবং উক্ত বংশধারারই অন্য কোন শক্তিশালী শাখা ক্ষমতা লাভ করে, যা মূলত গোত্রপ্রীতির উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে।

ইবনে খালদুন চারটি স্তরকে ব্যাখা করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সর্বোচ্চ এই চারটি স্তর পর্যন্ত একটি বংশ মোটামুটি টিকে থাকতে পারে, তারপর উক্ত বংশ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। যদিও চারটি মানদণ্ডের আলোকে তিনি এ ব্যাখা করেছেন। কিন্তু কখনো কখনো কোন বংশ এই চারটি ধাপ অতিক্রম করার পূর্বেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। আবার অনেক সময় কোন বংশকে এর অধিক সময় পর্যন্ত বংশ মর্যাদা রক্ষা করতে দেখা যায়, যদিও তা হয়ে থাকে পতনন্মোখ। ইবনে খালদুন পূর্ববর্তী আব্বাসীয় খলিফাদের সময়কালকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন- খলিফা মুতাসিম ও তার পুত্র ওয়াসিকের সময় তাদের গোত্রপ্রীতি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল তবে শুধুমাত্র অনারব তথা তুর্কি, দায়লাম ও সেলজুক প্রভৃতি জাতির উপরই তাদের সামান্য প্রভাব বজায় ছিল (Ibid, 292)। কিন্তু পরবর্তীতে তারাও বিদ্রোহ করে ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়।

তাই বলা যায় যে, একটি সাম্রাজ্যে শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শাসকগোষ্ঠী যদি বিলাসিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গোত্রীয় সম্পর্কের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে তখন তাদের মধ্যে কর্মতৎপরতায় শৈথিল্য এবং নানা প্রকার বদঅভ্যাসের জন্ম হয়। তাদের এই অতিরিক্ত বিলাসী জীবন যাপনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য ক্রমেই তারা স্বৈরাচারী হয়ে উঠে এবং অধীনস্থদের সাথে অন্যায় আচরণ করে। আর এভাবেই শাসকগোষ্ঠী সাধারণ জনতা থেকে দূরে সরে গিয়ে তাদের পতনের পথ ত্বরান্বিত করে। এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন যে তত্ত্ব দিয়েছেন তার সংক্ষেপ হলো, যখন শাসকগোষ্ঠী বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের অধিকাংশ বিলাসী জীবন যাপনের জন্য ব্যয় করে, ফলশ্রুতিতে যখন আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয়ভার বহন করতে হয় তখন তারা অতিরিক্ত করারোপ করে অথবা অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয় । আর এভাবেই একটা সাম্রাজের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে (Ibid, 315-316)।

সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কিত ধারণা

মানবসমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন নতুন সভ্যতার জন্ম দেয়। সমাজে বসবাসরত অধিবাসীদের জীবন যাত্রায় এ বিবর্তন ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ইবনে খালদুন একটি সাম্রাজ্যের বিবর্তনকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যথা- বিদ্রোহের দ্বারা বিজয়, স্বগোত্রীয়দের উপর প্রাধান্য বিস্তার, শান্তি-সচ্ছলতার যুগ, সন্তুষ্টি-স্বস্তির কাল এবং অপচয়-অপব্যয়ের কাল (Ibid, 326-328)।

১. বিদ্রোহের দ্বারা বিজয়: কোন সাম্রাজ্যের মধ্যে যখন সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যায় এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন অন্য কোন গোত্রের অথবা একই বংশের অন্য কোন শক্তিশালী অংশ গোত্রপ্রীতির শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এবং নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। আর এ পর্যায়ে বিজয়ী গোত্রের মধ্যে গোত্রপ্রীতি প্রবল পরিমাণে থাকে। তখন গোত্রের সকলেই নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিকে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেয়।

২.স্বগোত্রীয়দের ওপর প্রাধান্য বিস্তার: ক্ষমতা দখলের পর নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি তার স্বগোত্রীয়দের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের থেকে পরিপূর্ণ আনুগত্য আদায় করেন এবং এর পাশাপাশি বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে কঠোরভাবে দমন করেন। অতঃপর তিনি ক্ষমতাকে সুসংহত করে সম্রাট তথা একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার চেষ্টা করেন।

৩. শান্তি ও সচ্ছলতার যুগ: এই সময়কাল একটি সাম্রাজ্যের বিবর্তনের তৃতীয় পর্যায়। একটি সাম্রাজ্য যখন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন উক্ত সময় অতিবাহিত করে। এ পর্যায়ে সাম্রাজ্য অর্থনৈতিকভাবে অনেক সচ্ছল থাকে। ফলে সম্রাজ্যে বৃহৎ দরবারকক্ষ, অট্টালিকা, প্রশস্ত নগরী ও বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। এ পর্যায়ের সমস্তকাল জুড়েই সম্রাটগণ তাদের প্রতিপত্তি প্রকাশ, গৌরব বৃদ্ধি এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য আদর্শ স্থাপনের সুযোগ লাভ করেন।

৪. সন্তুষ্টি ও স্বস্তির কাল: নবনির্বাচিত সম্রাট তার পূর্বসূরীর নিকট থেকে বংশানুক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের সাথে তার সংযোগ খুব কম পরিমাণ থাকে। ফলে তিনি সাম্রাজ্যের উন্নয়নে নিজ উদ্যোগে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধান্বিত থাকেন। তাই তিনি পূর্ববর্তীদের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং সর্বদা রাজ্যের যেকোন কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করেন।

৫. অপচয় ও অপব্যয়ের কাল: এ পর্যায়ে সম্রাট রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব থেকে অনেক দূরে গিয়ে বিলাসিতায় মগ্ন হন এবং পূর্বসূরীদের সঞ্চিত সম্পদকে নিজের ইচ্ছামত অপব্যয় করেন। তখন তিনি অনেকের অপছন্দনীয় পাত্রে পরিণত হন এবং নিষ্ঠাবান কর্মীদের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন। সেসময়ই রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং একসময় তা ধ্বংসে পতিত হয়।

মানব আচরণের উপর প্রকৃতির প্রভাব সম্পর্কিত ধারণা

অধিকাংশ সময়েই প্রকৃতি তথা প্রাকৃতিক পরিবেশ মানব আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতার আলোকে মানব আচরণের বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। সাধারণত পরিবেশের তারতম্যের কারণে আরব সমাজে দুই ধরণের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা যায়- এক. শহুরে জীবন, দুই. যাযাবর জীবন। ইবনে খালদুন পরিবেশ ও প্রকৃতির আলোকে মানব আচরণের ব্যাখ্যায় বলেন:

> وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من فنون الملاذّ وعوائد التّرف والإقبال على الدّنيا والعكوف على شهواتهم منها وقد تلوّنت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشّرّ
>
> নাগরিকগণ সর্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ব্যসন, পার্থিব উন্নতি লাভের আশা ও তাকে ভোগ করবার স্পৃহার দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এর ফলে তাদের জীবাত্মা অসৎ চরিত্র ও অন্যায় প্রসঙ্গের মধ্যে কলুষিত হয়ে উঠে (Ibn Khaldūn 1988, 1/153)।

প্রান্তরের জনগোষ্ঠীরা তুলনামূলকভাবে শহরে বসবাসরত নাগরিকদের চেয়ে কম সুযোগ-সুবিধা পায়, সেজন্য তাদের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায় এবং তারা অন্যদের তুলনায় অধিক পরিমাণ সাহসের অধিকারী হয়। কিন্তু যখনই তারা সবুজ প্রান্তরে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রতি অগ্রসর হয় তখনই তাদের চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন বলেন:

> فكلّما نزلوا الأرياف وتفنّقوا النّعيم وألفوا عوائد الخصب في المعاش والنّعيم، نقص من شجاعتهم بمقدار ما نقص من توحّشهم وبداوتهم
>
> সবুজ প্রান্তর ও প্রাচুর্য্যের সাথে পরিচিত হওয়ার পর বেদুইনরা ভোগবিলাসিতায় মত্ত হয়। ফলে তাদের জীবন থেকে বন্য প্রকৃতি ও শৌর্যবীর্য হ্রাস পেতে থাকে (Ibn Khaldūn 1988, 1/173)।

উপসংহার

খোলাফায়ে রাশেদার সময়কালের পর থেকে মুসলিম শাসনামল তথা উমাইয়া খিলাফত থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর উসমানীয় খিলাফতের মধ্যেও ইবনে খালদুনের সমাজতত্ত্বের, বিশেষত আসাবিয়্যাহ্ সম্পর্কিত ধারণার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। ফলে তাঁর প্রদত্ত সমাজতত্ত্বের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। যদিও পশ্চিমা দেশসমূহ তার প্রদত্ত সমাজতত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন নতুন ধারণা প্রদান করেছে কিন্তু মুসলিম সমাজে এর চর্চার ক্ষেত্র খুবই সামান্য এবং এ ব্যাপারে অনাগ্রহ দৃষ্টিগোচর হয়। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আরব দেশসমূহকে

পশ্চিমা সমাজনীতির প্রতি আগ্রহী হতে দেখা যায়। কিন্তু আরব দেশগুলো পশ্চিমা সমাজনীতি গ্রহণের মাধ্যমেও যে প্রভূত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি তার অন্যতম জীবন্ত উদাহরণ হলো মধ্যপ্রাচ্য সংকট। যেহেতু ইবনে খালদুন আরব সমাজকে কেন্দ্র করেই তাঁর অনবদ্য রচনা আল-মুকাদ্দিমা লিখেছিলেন, তাই ধারণা করা যায় যে, তৎকালীন সমাজব্যবস্থার আলোকে প্রবর্তিত সমাজ সম্পর্কিত ধারণাসমূহ বর্তমান আরব সমাজের ক্ষেত্রেও সংকট নিরসন করে শান্তি ও শৃঙ্খলার সম্ভাবনা বয়ে আনতে পারে। বিশেষ করে বর্তমান এই শতধা বিভক্ত মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ইবনে খালদুনের আসাবিয়্যাহ্-র ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Bibliography

Al Qur'an

Al-Alam, Akhtar. 1989. *Ibn Khaldūn.* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Al-Attas, Sayed Farid. 2015. *Ibn Khaldūn.* Oxford University Press.

Al-Attas, Syed Farid. 2006/1. "A Khaldunian Exemplar for a Historical Sociology for the South." *Current Sociology,Vol 54(3).*

Al-Attas, Syed Farid. 2006/2. "Ibn Khaldūn and Contemporary Sociology." *International Sociology,vol 21(6).*

Al-Attas, Syed Hussein. 2006/3. "The Autonomous, the Universal and the Future of Sociology." *Current Sociology,Vol 54(1).*

Baali, Fuad. 1988. *Society, State and Urbanism: Ibn Khaldūn's Sociological Thought* . New york: State University Press.

Bryan S, Turner. 2009. *The New Blackwell Companion to Social Theory (Edited).* Blackwell Publishing Ltd.

Dhaouadi, Muhammad. 2006. "The Concept of Change in the Thought of Ibn Khaldūn and Western Classical Sociologists." *Islâm Araþtýrmalarý Dergisi.*

Enan, Mohammad Abdullah. 2006. *Ibn Khaldūn his life and works.* New Delhi Kitab bhavan.

Gellner, Ernest. 1984. *Muslim Society.* Cambridge University Press.

Giddens, Anthony. 2015. *Sociology (5th Edition).* Polity Press.

Gilbert, Mehmet Soyer & Paul. 2012. "Debating the Origins of Sociology: Ibn Khaldūn as a Founding Father of Sociology." *International Journal of Sociological Research, Vol 5.*

Ibn Khaldūn, Abd al-Rahman Ibn Muhammad. 1979. *Al-Tarif biIbn Khaldūn wa Rihlatahu Gharban wa Sharqan*. Beirut: Dar al-Kitāb al-Libnānī.

Ibn Khaldūn, Abd al-Rahman Ibn Muhammad. 1988. *Al-Muqaddimah.* Annotated by: Khalīl Shihādah. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Khaldūn, Abd al-Rahman Ibn Muhammad. 2017. *The Muqaddimah.* Translated by Golam Samdani Qurayeshi. Dhaka: Dibya Prakashan.

Irwin, Rovert. 2018. *Ibn Khaldūn: An Intellectual Biography.* Princeton University Press.

Nuruzzaman, Md. 2013. *Chirayata Samajchinta.* Dhaka: Nabajug Prakashani.

Sen, Anupam. 2008. *Bakti, Rashtra: Samaj-Binyas O Samaj-Darshaner Aloke.* Dhaka: Obosor Prakashana Sangstha.

Stolley, Kathy S. 2005. *The Basics of Sociology.* Greenwood Press.